সঙ্ঘাধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা ভক্তিপ্রাণামাতাজীর মহাপ্রয়াণ

শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের অধ্যক্ষা পরমপূজনীয়া প্রব্রাজিকা ভক্তিপ্রাণামাতাজীর জীবনাবসান হয়েছে গত ১১ ডিসেম্বর ২০২২ রাত ১১.২৪ মিনিটে, রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে।

মাতাজীর জন্ম ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে কলকাতার শ্যামবাজার অঞ্চলে। পূর্ব নাম কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায়। পিতা দ্বিজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মা শোভনা দেবী। সোমবার জন্ম বলে জননী তাঁকে 'ভোলা' বলে ডাকতেন। শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম ও হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ে তাঁর পড়াশোনা। তাঁর ছোটমামা ও কাকা ছিলেন বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী, যথাক্রমে স্বামী ধ্যেয়ানন্দ (গোপাল মহারাজ) ও স্বামী অভিন্নানন্দ (হরিচরণ মহারাজ)। তাঁদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কল্যাণী কৈশোরেই ত্যাগের জীবন যাপনের সংকল্প করেন। বেশ কয়েকজন শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদকে দর্শন করার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর। বেলুড় মঠে তিনি পরম পূজ্যপাদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর কাছে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন।

স্বামী দয়ানন্দ দক্ষিণ কলকাতার বকুলবাগান রোডে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে 'শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান' স্থাপন করেছিলেন প্রসূতি মায়েদের ও শিশুদের সেবার জন্য। কল্যাণীকে তিনি খুবই স্নেহ করতেন, তাঁকে নার্সিং প্রশিক্ষণ দিয়ে হসপিটালের কাজে যুক্ত করতে চাইতেন। স্নেহভরে বলতেন, ''কল্যাণীকে টেনে টেনে এত বড় করব যে সবাই একদিন হাঁ করে তাকিয়ে দেখবে।'' ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের বাক্য অমোঘ, কালই তার প্রমাণ রেখেছে।

বকুলবাগান স্থিত হসপিটালেই গোপাল মহারাজ কল্যাণীর নার্সিং ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করে দেন। তেরো-চোদ্দো বছর বয়সে তিনি সেখানে যান এবং ১৯৩৬ বা ১৯৩৭ সালে প্রথম স্থান অধিকার করে তৎকালীন 'শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান' থেকে নার্সিং পাস করেন। এটি ছিল বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিলের রেজিস্ট্রিকৃত মিডওয়াইফারি কোর্স।

১৯৩৮ সালের ৪ মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথিতে পূজ্যপাদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজ হসপিটালের স্থায়ী ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে আসেন ৯৯ ল্যান্সডাউন রোডে (বর্তমানে ৯৯ শরৎ বসু রোড, যেখানে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান)। এই সময়কার একটি ঘটনা মাতাজীর মুখে প্রায়ই শোনা যেত। বকুলবাগানে ডিউটি করতে করতে হঠাৎ শুনতে পেলেন প্রেসিডেন্ট মহারাজ এসেছেন। শোনামাত্র তিনি সব ছেড়ে প্রাণপণে দৌড়ে সেখানে উপস্থিত হন এবং মহারাজকে প্রণাম করে তাঁর আশীর্বাদ লাভ করেন।

কল্যাণীর কর্মনিষ্ঠা ও গভীর আগ্রহ দেখে দয়ানন্দজী তাঁকে হসপিটালে বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ পদে রাখতে চাইলেও, সাধুজীবন যাপনই তাঁর অন্তরের

একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল। ১৯৪০ সাল পর্যন্ত কল্যাণী শিশুমঙ্গলের সঙ্গে কর্মিরূপে যুক্ত ছিলেন। এরপর তিনি গ্রামীণ পরিবেশে অন্তর্মুখ আশ্রমজীবন যাপনের আকাঙ্ক্ষায় চব্বিশ পরগনার টাকি শহরে একটি আশ্রমে থাকতে শুরু করেন। সেখানকার রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সেক্রেটারি পূর্বোক্ত হরিচরণ মহারাজের ব্যবস্থাপনায় আশ্রমটি গড়ে উঠেছিল। ক্রমে ক্রমে বেশ কিছু মেয়ে সেখানে সমবেত হন। পূজনীয় স্বামী নির্বাণানন্দজী, নির্বেদানন্দজী, তেজসানন্দজী প্রমুখ তাঁদের অনুপ্রেরণা দিতেন।

১৯৪৬ সালে দাঙ্গা শুরু হলে টাকি থেকে তাঁরা বারাণসী ঘোষ স্ট্রিটের আশ্রমে চলে আসেন। সেখানে প্রায় কুড়িজন ত্যাগের জীবন কাটাতে চেয়ে সমবেত হয়েছিলেন, প্রায় সকলেই পড়াশোনা করতেন। এখানে এসে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর কল্যাণী তাঁদের দেখাশোনার ভার নেন।

১৯৫০ সালে তাঁরা স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর ব্যবস্থাপনায় রামকৃষ্ণ মিশনের শাখাকেন্দ্র নিবেদিতা স্কুলের সঙ্গে যুক্ত হন। এখন থেকে তাঁরা রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ অধীনে এলেন এবং কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুসারে তাঁদের বিভিন্ন কেন্দ্রের কর্মী হতে লাগলেন। টালিগঞ্জের শ্রীমোহন লেনে একটি পুরনো বাড়িকে প্রসূতিসদনের উপযোগী করে 'মাতৃভবন' নামকরণ হয়েছিল। কল্যাণী সেখানকার কর্মী হন এবং ১৯৫৫ সালে মাতৃভবনের সম্পাদিকা হন।

বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মশতবর্ষে (১৯৫৩-৫৪) স্বামীজীর পরিকল্পিত স্ত্রীমঠ প্রতিষ্ঠার সংকল্প করেন। রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রে আশ্রমজীবন যাপনেচ্ছু যেসব মহিলা কর্মী ছিলেন তাঁদের মধ্য থেকে সাতজনকে নির্বাচন করে তাঁরা ব্রহ্মচর্য দানের পরিকল্পনা করেন। তাঁদের মধ্যে কল্যাণী ছিলেন অন্যতম। ১৯৫৩ সালের ২৭ ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথিতে বেলুড় মঠের পুরনো ঠাকুরঘরে তৎকালীন সঙ্ঘাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ সাতজন ব্রতধারিণীকে ব্রহ্মচর্যদীক্ষা দান করেন। মেয়েদের মঠের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য তাঁরা কাশী থেকে শ্রীশ্রীমায়ের শিষ্যা ও সেবিকা সরলা দেবীকে আনিয়েছিলেন। ১৯৫৪ সালের ২ ডিসেম্বর দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গাতীরে 'সুরধুনী কাননে' শ্রীসারদা মঠের প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন করেন বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ। ১৯৫৯ সালের ১ জানুয়ারি মায়ের জন্মতিথিতে বেলুড় মঠে শঙ্করানন্দজী পূর্বোক্ত সাতজন ব্রহ্মচারিণী এবং সরলা দেবীকে (শরৎ মহারাজের কাছে পূর্বেই কৌল সন্ন্যাসপ্রাপ্ত এবং 'শ্রীভারতী' নামপ্রাপ্ত) যথাবিধি বিরজাহোম করে সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত করেন। কল্যাণীর নাম হল প্রব্রাজিকা ভক্তিপ্রাণা। অন্যান্যরা : প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা, মোক্ষপ্রাণা, মুক্তিপ্রাণা, বিদ্যাপ্রাণা, শ্রদ্ধাপ্রাণা, দয়াপ্রাণা এবং মেধাপ্রাণা। এঁরাই শ্রীসারদা মঠের প্রথম আটজন সন্ন্যাসিনী।

প্রব্রাজিকা মেধাপ্রাণা ব্যতীত অপর সাতজনকে ১৯৫৯ সালে ট্রাস্টি করে তাঁদের ওপর স্বাধীন সারদা মঠের ভার অর্পণ করেন বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ। পরের বছর রামকৃষ্ণ সারদা মিশন রেজিস্ট্রিকৃত হলে তাঁরা গভর্নিং বডির সদস্য হন। ১৯৬১ সালে রামকৃষ্ণ মিশন, রামকৃষ্ণ সারদা মিশনকে মাতৃভবন হস্তান্তরিত করেন। ভক্তিপ্রাণা-মাতাজীই সম্পাদিকা থাকেন—২০০৯ সালে সঙ্ঘাধ্যক্ষা হয়ে সারদা মঠে চলে আসা পর্যন্ত।

মাতৃভবন এবং সংলগ্ন অঞ্চলে মাতাজী 'বড়মা' নামে পরিচিত। বলতে গেলে মাতৃভবন এবং 'বড়মা' আজ প্রায় সমার্থক। মাতৃভবন ছিল তাঁর কাছে মন্দির, তাঁর ধ্যানজ্ঞান। সকালবেলা প্রথমে হসপিটালের সিঁড়ি ছুঁয়ে প্রণাম করে সিঁড়িতে পা দিতেন। একজন লন্ডন থেকে ডাক্তারি পাশ করে মাতৃভবনে ত্যাগব্রতীরূপে যোগদান করতে এলে

মাতাজী তাঁকে হসপিটালে নিয়ে গিয়ে বলেন, ''এই তোমার মন্দির।'' বস্তুত মাতৃভবনে সেবারত সকল সন্ন্যাসিনী-ব্রহ্মচারিণীই বিভিন্ন প্রসঙ্গে এই কথাটি বহুবার মাতাজীর মুখে শুনেছেন। মাতাজী কখনও 'পেশেন্ট' বা 'রোগী' বলতেন না, বলতেন 'মা'। মাতাজী এই ধারা প্রবর্তন করেন যে, হসপিটালে রান্না হওয়ার পর প্রথমে পেশেন্টদের জন্য খাবার যাবে, তারপর অন্যেরা খেতে পারবে। পেশেন্টদের তরকারি রোজ নিজে খেয়ে দেখতেন কেমন হয়েছে। একদিন পেশেন্টদের খাবার দেওয়ার লোক আসেনি দেখে ভাণ্ডারিকে জপ থেকে তুলে মাতাজী বলেন, ''মায়েরা খাবার পায়নি, আর তুমি এখানে বসে কার জপ করছ?'' মাতৃভবনের প্রথমদিকে তিনি আর সেবাপ্রাণাজী ভোরে উঠে প্রথমে হসপিটালের বাথরুম পরিষ্কার করে, বেডপ্যান মেজে স্নান করতেন; তারপর পোশাক পরে ডিউটিতে যেতেন। পরের দিকেও, কাজের লোক না এলে মাতাজী সকলের অগোচরে নিজেই বেডপ্যান মেজে রাখতেন। একবার পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায় হাসপাতালের একটি ব্লক উদ্বোধন করতে আসেন। অন্য একটি ব্লক পরিদর্শনে গিয়ে রোগীর বাথরুমে ঢুকে বেডপ্যান দেখে তিনি সত্তর হাজার টাকার চেক লিখে দিয়ে বলেন, এখানে ঠিক ঠিক সেবা হয়।

তখন নতুন পেশেন্ট এলেই বেল বাজত। কোনও কারণে দুবার বেল বাজলেই মাতাজী নিজে নেমে যেতেন। হয়তো তখনই জপ করতে বসেছেন বা সারাদিনের পরে খেতে বসেছেন, সঙ্গে সঙ্গে সব ছেড়ে উঠে পড়তেন।

হসপিটালের সর্বত্র মাতাজীর সজাগ দৃষ্টি থাকত। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বহুবার রাউন্ড দিতেন। রাতে ডিউটিতে থাকা নার্সরা জানত যেকোনও সময় বড়মা এসে পড়বেন। শিশু জন্মালেই মাতাজী তাদের শ্রীরামকৃষ্ণ নাম শোনাতেন। যেকোনও বিভাগের কর্মী কোনও সমস্যা নিয়ে মাতাজীর কাছে গেলে তিনি তৎক্ষণাৎ মনোযোগ দিয়ে শুনে সমাধানে সচেষ্ট হতেন, নিজে সেই দায়িত্ব নিতেন। ডিউটি করছেন এমন নার্সদের প্রণাম মাতাজী কখনও নিতেন না। বলতেন, ''এ-পোশাকের আলাদা মর্যাদা আছে।'' শুনে শ্রোতারাও এ-কাজের মহত্ত্ব অনুভব করতেন।

সকলের প্রতি মাতাজীর অসীম করুণা, ভালবাসা ও সেবা আজ কিংবদন্তি। মাতাজী বেশি কথা না বললেও তাঁর নিঃস্বার্থ ভালবাসা সকলেই বুঝতে পারত। অনেক সময় দেখা যেত রোগীরা তাদের সমস্যার কথা ডাক্তারকে না বলে তাঁকে জানাচ্ছে। তাদের বিশ্বাস ছিল, মাতাজীকে জানালেই তারা ভাল হয়ে যাবে। যে যত অবহেলিত তার প্রতি তাঁর তত ভালবাসা। একজন জমাদার খুব মদ খেত। মাতাজী নিজে মাংস রান্না করে তাকে খাওয়াতেন। কারণ হিসেবে বলতেন, সে ভাল জিনিসের স্বাদ পেলে হয়তো মন্দটা ছেড়ে দেবে। ঝাড়ুদার বা ওইরকম কেউ মদ খেয়ে রাস্তার ধারে শুয়ে আছে দেখলে মাতাজী তাকে ডেকে এনে পেট ভরে ভাত খাইয়ে বাড়ি পাঠাতেন। রিকশা ইত্যাদিতে উঠলে তিনি ভাড়া বাবদ হাতের মুঠোয় টাকাপয়সা যা উঠত সব দিয়ে দিতেন।

১৯৭৮-এর বন্যায় স্থানীয় বিস্তীর্ণ এলাকায় মাতাজীর তত্ত্বাবধানে ব্যাপক সেবার কথা আজও মানুষের মুখে মুখে ফেরে। ভুবনেশ্বরে সুপার সাইক্লোন হলে মাতাজী ত্রাণসেবা করতে যান। যাওয়ার আগের দিন ম্যালেরিয়া, ১০৪-১০৫ জ্বর। তবু পরদিন মাতাজী গেলেন। অতি প্রত্যন্ত বন্যাদুর্গত অঞ্চল—যেখানে কেউ যেতে পারত না—সেখানেও তিনি যেভাবে হোক পৌঁছে যেতেন। ওড়িশায় মাতাজী বহুবার সেবাকাজ করেছেন। সেখানকার মানুষ তাঁর কথা সজলনয়নে আজও স্মরণ করেন।

জপের ওপর মাতাজী খুব জোর দিতেন। সকলকে রাতে জপ করতে বলতেন—বিশেষত পূর্ণিমা, অমাবস্যা, একাদশী আর শনি-মঙ্গলবারে। তাঁর সঙ্গে ট্রেনে যেতে যেতে অনেকেই দেখেছেন তিনি সারারাত বসে জপ করছেন। যাঁরা বেশি লেখাপড়া না করার ফলে বা অসুস্থতার জন্য সঙ্ঘে যোগদান করতে পারেননি তাঁদের সবাইকে মাতাজী আশ্রয় দিতেন। তাঁদের অনেকেরই জীবন তাঁর সান্নিধ্যে খুব উন্নত হয়েছিল। মাতাজী তাঁদের সকলকে সম্মান দিয়ে খুব যত্ন করে মাতৃভবনে রেখেছিলেন।

ছোট-বড়, তথাকথিত উচ্চ-নীচ সকলের জন্য মাতাজীর সমান অনুভূতি। সকলেই সেটি বুঝতেন। যাকে কেউ পছন্দ করত না সেও বলত, ''বড়মা কাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন জানেন?—আমাকে।'' জমাদার থেকে সবচেয়ে উচ্চপদস্থ যিনি—সকলেই বলতেন, ''বড়মা যতদিন আছেন ততদিন যত অসুবিধাই হোক হসপিটাল ছেড়ে যাব না।'' আয়াদের মুখে শোনা যেত, ''বড়মা এখানে কাজ দিয়েছেন বলে আমরা সুস্থভাবে জীবন কাটাতে পারছি, নইলে কোথায় ভেসে যেতাম।'' মাতাজী কালীঘাট সংলগ্ন বস্তি অঞ্চলে মোটামুটি শিক্ষিত মেয়েদের কাজ শিখিয়ে হসপিটালে কাজ দিতেন। 'সহায়িকা প্রশিক্ষণ' নাম দিয়ে হসপিটালের নিজস্ব একটি কোর্স চালু করেছিলেন—তাতে অতিদরিদ্র মেয়েরা স্কলারশিপ সহ ট্রেনিং নিতে পারত এবং মাতৃভবনে তো বটেই, অন্যান্য জায়গাতেও কাজ পেয়ে যেত।

মাতৃভবনে মাতাজীর কাছে বহু মানুষ এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলতেন। ডাক্তার-রোগী-ভক্ত বা পাগল—সকলের প্রতি মাতাজী একইরকম মনোযোগী, ধৈর্যশীল। বিরক্তি বা রাগ তাঁর মধ্যে কখনও দেখা যেত না। ভালবাসার সঙ্গে ছিল অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। সবাই জানে 'বড়মা ভীষণ স্ট্রিক্ট'। অথচ যত পাগল, আধপাগল, ছিটগ্রস্ত সকলের অবারিতদ্বার মাতৃভবনে। যতক্ষণ ইচ্ছা মাতাজীর সঙ্গে আবোলতাবোল কথা বলে খেয়ে তারা বাড়ি ফিরত। তাঁর স্নেহস্পর্শ উন্মাদেরাও ঠিক বুঝতে পারত। সকলে তাঁর মধুর আচরণে, অপার্থিব ভালবাসায় বাঁধা পড়ে যেত। তাঁকে দৈবী মানুষ বলে অনুভব হত সকলেরই। হসপিটালে কোনও গুরুত্বপূর্ণ মিটিং-এ অফিসাররা নানা আলোচনা করে শেষে বলতেন, ''এখন বড়মা যা বলবেন আমরা সেটাই করব।''

একবার এক ব্রহ্মচারিণীকে রাতে ডিউটি দিতে বললে তিনি জানান, পরদিন সকালে তাঁর বেবিক্লিনিকে ডিউটি আছে। তাঁর ভয়, রাত জাগলে সকালে যদি কাজটি ঠিকমতো করতে না পারেন! মাতাজী তাঁকে বললেন, ''তুমি অসুস্থ হলে তোমার মা সারারাত জেগে পরদিন বাবার জন্য রান্না করে তাঁকে অফিসে পাঠাননি?'' ব্রহ্মচারিণী বুঝতে পারলেন দৃষ্টিভঙ্গির এই পার্থক্যই মাতাজীকে এত মহান করেছে।

মাতাজীর জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য নিয়মানুবর্তিতা। তাঁকে দেখে ঘড়ি মিলিয়ে নেওয়া যেত। রাতে ঘুমোতে যত দেরিই হোক, ভোরবেলা ঠাকুরঘরে উপস্থিত থাকতেনই। সন্ন্যাসিনী-ব্রহ্মচারিণীদের ক্লাস নিতেন বেলা তিনটের সময়। স্বামীজীর কোনও বই বা আর কিছু পড়ে শোনাতেন। ক্লাসে আসতেই হত। ক্লান্তি বা এমন কোনও অজুহাত কেউ দেখালে মাতাজী বলতেন, ''স্বামীজীর কথা পড়লে শুনলে শোয়া মানুষ উঠে বসে, বসা মানুষ উঠে দাঁড়ায়, দাঁড়ানো মানুষ দৌড়োয় আর দৌড়নো মানুষ থামে না।''

একদিন মাতৃভবনের দরজায় একটি সদ্যোজাত শিশুকন্যাকে কেউ ফেলে রেখে যায়। বড়মা তাকে একজনের কাছে রেখে মানুষ করেন, তার সব দায়িত্ব নেন। সে বড় হয়ে লেখাপড়া শিখে

হসপিটালে ভাল কাজ করত। একদিন মাতাজীর মুখের ওপর সে খুব উদ্ধতভাবে নানা কথা বলে। উপস্থিত সকলে ক্রুদ্ধ হলেও মাতাজী শান্তভাবে বলেন, ''ওর যা আছে ও তা-ই আমাকে দিল, আমার যা আছে আমাকেও তো তা-ই দিতে হবে। তাছাড়া ওর জন্য করেছি বলেই যে ও আমাদের এখানে কাজ করবে তা আমরা কেন আশা করব?''

একবার এক পেশেন্ট মারা গেলে উন্মত্ত জনতার মাঝে মাতাজী একাই চলে গিয়ে বলেন, ''বাইরে চলুন। হসপিটালের ভিতর গণ্ডগোল নয়, এখানে আমার মায়েরা আছেন।'' কিছুক্ষণ কথা বলতেই তারা সবাই শান্ত হয়ে চলে যায়।

একদিন একজন পেশেন্টের অবস্থা হঠাৎ আশঙ্কাজনক হয়ে উঠেছে কিন্তু তাঁর বাড়িতে আর একটি বিপদ হওয়ায় বাড়ির সকলে সেখানেই আছেন। পেশেন্ট পার্টির অনুপস্থিতিতেই নিজে দায়িত্ব নিয়ে মাতাজী বন্ডে সই করে সেই পেশেন্টকে ও.টি.-তে তুললেন। আজও তাঁর পরিবারের সবাই কৃতজ্ঞচিত্তে বলেন, এতবড় ঝুঁকি নিয়ে আইন-আদালতের তোয়াক্কা না করে এ-কাজ একমাত্র বড়মা-ই করতে পারেন।

মাতাজী কোনও পেশেন্টের অবস্থা আশঙ্কাজনক শুনলে থমথমে মুখে নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিতেন। তাঁকে কিছু খাওয়ানো যেত না তখন। রোগী বিপন্মুক্ত জানতে পারলে তবে বেরোতেন, তারপর আগে মন্দিরে যেতেন। একবার মাতৃভবন থেকে একটি শিশু চুরি হয়ে যায়। মাতাজী শ্রীশ্রীমায়ের ছবির সামনে টানা তিনদিন বসে থাকেন দরজা বন্ধ করে। তিনদিন পরে অভাবনীয়ভাবে শিশুটিকে পাওয়া গেল। সে-সংবাদ পেয়ে তবে মাতাজী বাইরে বেরোলেন। কোর্টে সেই সংক্রান্ত কেস চলেছিল। কোর্ট থেকে পরপর তিনবার নোটিস এলেও মাতাজী কাউকে পাঠালেন না। একদিন আলিপুর কোর্ট থেকে এক অফিসার এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে তিনটি চিঠি দেখিয়ে জানতে চান—এ-চিঠি তিনি পেয়েছেন কী না। মাতাজী জানান পেয়েছেন; কিন্তু মায়ের কোলে শিশু ফিরে গেছে এটাই শেষ কথা—কে দোষ করেছে বা কে শাস্তি পাবে তা নিয়ে তিনি আর ভাবতে চান না। তখন অফিসার বলেন, চিঠি পেয়েও কোর্টে না যাওয়ার, আদালত অবমাননার পরিণাম তিনি জানেন কি? মাতাজী বলেন যে তিনি জানেন না। অফিসার জানালেন—হাতকড়া। সঙ্গে সঙ্গে মাতাজী দুটি হাত বাড়িয়ে দেন। দেখে শুনে অফিসার আর কিছু বলতে পারেননি। মাতাজীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি ফিরে যান।

শিশুচুরির পর একদল মহিলা হসপিটালের সামনে সভা করে বলতে থাকেন—শিশুকে হত্যা করে হসপিটালের ভিতরেই যে পুঁতে দেওয়া হয়নি তাই বা কে জানে। এমন কথা শুনেও মাতাজী নম্রভাবে তাঁদের বলেন, ''ঠিকই বলেছেন মা। সব দোষ আমারই। দারোয়ান যে গাফিলতি করেছে সে তো আমারই দোষ, কারণ দারোয়ানকে তো আমিই নিয়োগ করেছি।'' মাতাজীর ব্যবহারে তাঁরা নরম হয়ে ফিরে যান। তিনি প্রয়োজনে এত নিচু হতে পারতেন যে সবাই অবাক হয়ে যেত।

একবার এক ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে হসপিটালে ভর্তি করতে এসে মাতাজীকে জানান, তাঁর আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ। একথা শুনে মাতাজী তাঁর কাছ থেকে দশ টাকা নিয়ে বলেন, আর কোনও টাকা লাগবে না। এই ধরনের শত শত দৃষ্টান্ত রয়েছে। সেদিন ভদ্রলোক কৃতজ্ঞতায় কেঁদে ফেলেছিলেন। আজ পর্যন্ত তিনি মাতৃভবনে কম টাকায় দুধ সরবরাহ করেন।

কারও সম্পর্কে নিন্দা বা সমালোচনা মাতাজী শুনতেন না বা করতেন না। একেবারেই পছন্দ করতেন না কারও নামে কথা বলা। যদি নিজের কষ্টের কথা কাউকে বলতেই হয় তো তাঁর

ব্যবস্থাপত্র ছিল—''শ্রীশ্রীমাকে বলো।''

সবার প্রতি অসামান্য ভালবাসা অথচ সঙ্গে মিশে থাকত অপার নির্লিপ্তি। বহু বছর একসঙ্গে আছেন এমন একজন সন্ন্যাসিনী যখন শেষ শয্যায়, তখন তাঁর সেবা মাতাজী নিজের হাতে করেছিলেন। মাতাজীর ভালবাসা দেখে মনে হত, তাঁর শরীর গেলে মাতাজীর কী কষ্টটাই না হবে! অথচ তাঁর শরীর চলে গেলে দেখা গেল মাতাজী গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে করণীয় সবই করলেন কিন্তু অত্যন্ত নিরাসক্ত হয়ে। তেমনই, ঊনষাট বছর মাতৃভবনে থাকার পর যখন মঠে চলে এলেন তখনও এ নিয়ে মাতাজীর কোনও কথা বা আবেগ দেখা যায়নি। বস্তুত তাঁর প্রচণ্ড কর্মতৎপর জীবনে ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত ছিল নীরব একটি সাধনজীবন—যার মূল সুর শরণাগতি আর আত্মবিলয়।

২০ ডিসেম্বর ১৯৯৮ মাতাজী শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের সহাধ্যক্ষা এবং ২ এপ্রিল ২০০৯ তারিখে সঙ্ঘাধ্যক্ষা পদে বৃত হন। তাঁর সময়ে বিভিন্নভাবে মঠ ও মিশনের কার্যধারার সম্প্রসারণ ঘটে। বহু পূর্বেই তাঁর উদ্যোগে ও সর্বাঙ্গীণ ব্যবস্থাপনায় ভুবনেশ্বর, ঠাকুরনগর (মেদিনীপুর) এবং শিল্লা-য় (বর্ধমান) কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। তিনি সঙ্ঘাধ্যক্ষা থাকাকালীন বহরমপুর (২০০৯), বালুরঘাট (২০১১) ও পশ্চিম মেদিনীপুর (২০২১) কেন্দ্র গড়ে ওঠে। বহু বছরের প্রচেষ্টায় ভগিনী নিবেদিতার বাসগৃহ মাতাজীর সময়েই পাওয়া যায়; বাড়িটির উদ্বোধন-পূজাও তিনিই সম্পন্ন করেন। বহু কেন্দ্রে মন্দির ও প্রার্থনাগৃহ এবং বিভিন্ন জনহিতকর সেবাকাজের উদ্বোধন করেছিলেন মাতাজী। সঙ্ঘাধ্যক্ষা হয়ে মঠে আসার পর তাঁর অন্তর্মুখ অবস্থা, বিশেষত শেষ কয়েক বছর তাঁর মাতৃময়তা সকলকে মুগ্ধ করত। 'ঝড়ের এঁটো পাতা হয়ে থাকো'—কথামৃতোক্ত এই উপদেশ ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র; নিজে ছিলেন তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত এবং কেউ উপদেশ প্রার্থনা করলে সংক্ষেপে এই কথাটিই সাধারণত বলতেন। একটি-দুটি কথা, হাসিমুখ, সস্নেহ দৃষ্টিই সকলকে আনন্দে ভরিয়ে দিত। তাঁর কাছে কয়েক মুহূর্ত থাকলেই মনে এক অদ্ভুত আনন্দের অনুভূতি হত যা সকলেই অনুভব করতেন। অভয় ও আশ্বাসে পূর্ণ গুরুশক্তি যেন রূপ পরিগ্রহ করেছিল তাঁর মধ্যে। হয়ে উঠেছিলেন হাজার হাজার ভক্তের আশ্রয়।

মাতাজীর শরীর শেষ পর্যন্ত ভালই ছিল। ২০২২ সালের প্রথম থেকে তাঁর অন্ত্রের সমস্যা দেখা দেয়। ৫ ডিসেম্বর তাঁকে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করতে হয়। ক্রমশ শারীরিক জটিলতা বাড়ে, তিনি সেপটিসেমিয়ায় আক্রান্ত হন। কথামৃতের প্রতি মাতাজীর গভীর আকর্ষণ ছিল। শরীরত্যাগের দুদিন আগেও তিনি কথামৃত পড়েছিলেন এবং কয়েক ঘণ্টা পর হুবহু তা উদ্ধৃত করেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদদের দীক্ষিত সন্তানদের মধ্যে মাতাজীই ছিলেন সর্বশেষ। শ্রীসারদা মঠের প্রথম আটজন সন্ন্যাসিনীরও তিনি শেষ প্রতিনিধি। তাই বলাই যায়, তাঁর মহাপ্রয়াণে একটি যুগের অবসান হল। মাতাজীর প্রয়াণে শোকজ্ঞাপন করেন অনেকেই। টুইটে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, ''শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের মাধ্যমে সমাজসেবায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাওয়ার জন্য প্রব্রাজিকা ভক্তিপ্রাণামাতাজী চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।'' মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি শোকবার্তায় বলেন, ''প্রব্রাজিকা ভক্তিপ্রাণামাতাজীর জীবনাবসান সমস্ত অনুরাগী ও ভক্তদের কাছে অপূরণীয় ক্ষতি।''

ত্যাগে প্রেমে ভক্তিতে সেবায় মণ্ডিত এই মহাজীবনকে লিপির তুলিতে আঁকবার চেষ্টা বৃথা। তাঁকে আমাদের অন্তরের প্রণাম নিবেদন করি।